দ্বিতীয় অধ্যায়

স্তোত্র সাহিত্যের বৈচিত্র্য

শ্রেণী বিন্যাস

দ্বিতীয় অধ্যায়

স্তোত্র সাহিত্যের শ্রেণীবিন্যাস ও বৈচিত্র্য

স্তোত্র শব্দটি পারিভাষিক ও প্রাচীন ঋগ্‌বেদের অষ্টম মণ্ডলে ইন্দ্রদেবতা সম্বন্ধে এই ঋক্‌-টি পাওয়া যায় —

স্তোত্রমিন্দ্রায় গায়ত পুরুনৃম্ণায় সত্বনে ।
নকির্যং বৃণ্বতে যুধি ॥ (৮।৪৫।২১)

— বহু ধনশালী দানশীল ইন্দ্রের উদ্দেশে স্তোত্র পাঠ কর । যুদ্ধে কেউ তাঁকে হারাতে পারে না । স্তোত্র হচ্ছে কোন দেবতা বা উচ্চতর শক্তির গুণ-মহিমাদি কীর্তন । শব্দ-টির ব্যুৎপত্তি হয়েছে রতি ও প্রশংসার্থক 'স্তু' - ধাতু থেকে । (স্তু + ত্র - ভাবে) স্তব, স্তুতি, নুতি সমপর্যায়ের শব্দ । "স্তবস্তোত্র স্তুতি নুতি ইত্যমরঃ। (স্বর্গবর্গ-১৬১) । প্রশস্তি শব্দটি-ও সমার্থক । তবে সাধারণতঃ মানুষের ক্ষেত্রেই প্রশস্তি শব্দটি ব্যবহৃত হয় ।

রূপগত দিক থেকে স্তোত্রকে বলা যায় খণ্ডকাব্য । এক বা একাধিক শ্লোকে রচিত হতে পারে স্তোত্র । খণ্ডকাব্যের ধারায় পঞ্চক, অষ্টকাদি নামে-ও স্তোত্রের নামকরণ হতে পারে । স্তোত্র কাব্যের-ও অপরিহার্য শর্ত হচ্ছে ছন্দোবদ্ধ গীত-ময়তা । গদ্যে রচিত প্রশস্তিমূলক কাব্যের প্রাচীন নাম শস্ত্র —

অপ্রগীত মন্ত্রসাধ্য গুণিনিষ্ঠ গুণাভিধানং শস্ত্রম্ ।
প্রগীত মন্ত্রসাধ্য গুণিনিষ্ঠ গুণাভিধানং স্তোত্রম্ ॥

সুতরাং স্তোত্রের মধ্যে কেবল ছন্দের দোলা নয়, সুরবৈচিত্র্য, গীতময়তাদি-ও প্রত্যাশিত। বৈদিক সাহিত্যে ঋক্ সংহিতার সূক্তগুলি যখন বিশেষ সুরে গীত হয়, তখন সামবেদের অন্তর্ভুক্ত তার তার আবেদন-ও হয় অধিকতর হৃদয়গ্রাহী ।

শ্রেণী বিভাগ

সংস্কৃত স্তোত্র চতুর্বিধ —

দ্রব্যস্তোত্রং কর্মস্তোত্রং বিধিস্তোত্রং তথৈব চ ।
তথৈবাভিজন স্তোত্রং স্তোত্রমেতচ্চতুষ্টয়ম্ ॥

(মৎস্যপুরাণ, ১৫১ অঃ)

দ্রব্যস্তোত্র, কর্মস্তোত্র, বিধিস্তোত্র আর অভিজন স্তোত্র — এই চার প্রকার ভেদ স্তোত্র সাহিত্যের নাম থেকেই সাধারণভাবে তার বিষয়গুলির পার্থক্য বা বৈশিষ্ট্য অনুমিত হয় ।

কোন দ্রব্য বা বস্তুর কোন তীর্থস্থান, তিথি, নদী, পর্বত, বন প্রভৃতির গুণাদি বর্ণিত হয় যে স্তোত্রে তা দ্রব্যস্তোত্র । হরিদ্বার, বারানসী, বৃন্দাবন প্রমুখ তীর্থস্থান, গঙ্গা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র গোদাবরী প্রমুখ নদীর মহিমা, কেদার-বদরী-অমরনাথ প্রমুখ পর্বত, গঙ্গাসাগরাদি তীর্থে পৌষ সংক্রান্তিতে স্নান, বিভিন্ন পুণ্যতিথিতে স্নানাদির বিশেষ মহিমা কীর্তনাদি তুলসী, বিল্ববৃক্ষের মহিমা — এগুলিও দ্রব্য স্তোত্রের মধ্যে ধরা চলে ।

কর্মস্তোত্রের বাচ্য হচ্ছে কোন বিশেষ কর্মের বিশেষ মাহাত্ম্য কীর্তন । কোন যজ্ঞানুষ্ঠান বা বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য — যেমন রোগমুক্তির জন্য লক্ষ মন্ত্র জপের ব্যবস্থা বা বিশেষ পূজা বা যজ্ঞের । স্থান-কাল বিশেষে স্বর্ণ, গোধনাদি দানের মহিমা কীর্তনাদি ।

বিধিস্তোত্র — কোন বিশেষ কর্মের জন্য বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির অধিকার মধ্যে কর্মটি নিষ্পন্ন হলে ফলপ্রাপ্তি বিশেষ মহিমার ঘোষণা ।

আর অভিজন স্তোত্র হচ্ছে দেবতা বা দেবোপম কোন ব্যক্তির মহিমা কীর্তন । স্তোত্র বলতে অভিজন স্তোত্রকেই সাধারণভাবে বুঝায় । আর বিপুল স্তোত্র-সাহিত্যের ৯৯ শতাংশ বা ততোধিক অংশই অভিজন স্তোত্র । সুতরাং মুখ্যতঃ অভিজন স্তোত্রের প্রাধান্য সুস্পষ্ট ।

স্তোত্র ও কবচ

স্তব কবচ শব্দটি একই সঙ্গে উচ্চারিত হয়। স্তব-স্তুতির মতো স্তব-কবচ-ও একটি অতি পরিচিত শব্দদ্বৈত। সংস্কৃত স্তব সংকলনের গ্রন্থগুলিতে প্রায় সর্বত্র-ই কবচের-ও সংগ্রহ থাকে। গ্রন্থনামাতে-ও থাকে এই স্বীকৃতি স্তব-কবচমালা ইত্যাদি। কবচ শব্দটির অর্থ বর্ম— দুর্ভেদ্য আচ্ছাদন যা বাহির উৎক্ষিপ্ত যে কোনো অস্ত্র প্রহারকে প্রতিরোধ করতে সমর্থ। "কং-দেহং বঞ্চতি বিপক্ষাস্ত্রানি রক্ষঃয়িত্বা রক্ষতীতি।" মহাভারতে আছে কর্ণের সহজাত কবচ-কুণ্ডলের কথা। কবচাচ্ছাদন থাকায় দরুণ কর্ণের দেহ অস্ত্রবিদ্ধ হোতো না। তাই অর্জুনের দেবপিতা ইন্দ্রদেব — ভিক্ষার ছলে কর্ণের কবচকুণ্ডল হরণ করে, অর্জুনের অস্ত্রাঘাতে কর্ণকে আহত হবার সুযোগ করে দিয়েছিলেন।

যাহোক শাস্ত্রে আছে — মন্ত্রাদি দ্বারা-ও কবচ নির্মাণ করা যায়। রক্ষক-রূপী উদ্দিষ্ট দেবতা বিশেষের যথাবিধি পুজার্চনা করে ভুর্জপত্রে রক্ষামন্ত্রাদি লিখে, কোন বিশেষ দ্রব্যসহ বা অমনি তাম্র বা লৌহ বা রজত আধারে অর্থাৎ মাদুলীতে তা ঢুকিয়ে দিয়ে গলায় বা ডান হাতে বেঁধে দেওয়া হয়। এই একই উদ্দেশ্যে মাদুলী ধারণ সহ বা আলাদা করে রক্ষক দেবতা বিশেষের যে স্তব করা হয় — সেই স্তবের পারিভাষিক নাম কবচ। মুখ্যত: তন্ত্রগ্রন্থেই কবচাদি সুলভ। কোন কোন পুরাণে-ও পাওয়া যায়। গ্রন্থনা ও আঙ্গিকের দিক থেকে কবচ ও স্তোত্রের মধ্যে পার্থক্য নেই। তবে কবচে মন্ত্রবীজাদির সংযোজন থাকে। ভাষার পার্থক্য থাকে। কবচের ভাষা সাদামাটা। কিন্তু স্তোত্রের ভাষা বৈদিক, পৌরাণিক, তান্ত্রিক বা আচার্যদের কৃত— যেমনই হোক না কেন — সর্বত্র, গীতিময়তা, ছন্দ-অলংকারের সৌন্দর্য ও কাব্যমাধুর্য মণ্ডিত। স্তোত্রের মধ্যে উচ্চাঙ্গের সাহিত্য রস থাকে। কবচের উদ্দেশ্য রক্ষা পাওয়া, তাই 'রক্ষতু' ইত্যাদি শব্দের প্রাচুর্য থাকে এবং দেবতা বিশেষের বীজমন্ত্রাদির প্রয়োগ থাকে। স্তোত্রের মধ্যে — দেবতার প্রীতি ও সন্তোষ বিধান-ই মুখ্য — প্রার্থনা গৌণ। আর কবচের মধ্যে রক্ষণ বা আপদুদ্ধারণ-ই একমাত্র কাম্য। বীজমন্ত্রাদি সহ কবচ-মন্ত্রকে একবারে রক্ষা-আকুতি সর্বস্ব বলা যায়। খুব পরিচিত শনিঠাকুর বা

শনৈশ্চরদেবতা বা গ্রহের স্তব ও কবচ দুটি উল্লেখ করে পার্থক্যটি বিচার করা যাক।

বিশেষ পূজাদির সংকল্প বাক্যাদি নিত্যক্রিয়ায় আবশ্যক হয় না বটে কিন্তু নিত্যকার স্তব বা কবচাদির ক্ষেত্রেও প্রারম্ভিক পাঠ থাকে। যেমন, শনি-স্তবের প্রারম্ভিক পাঠ এইরকম —

ক) "অস্য শ্রীশনৈশ্চর স্তোত্রস্য-ঐস্য দশরথ ঋষিঃ
শনৈশ্চরো দেবতা ত্রিষ্টুপ ছন্দঃ শ্রীশনৈশ্চর প্রীত্যর্থং
জপে বিনিযোগঃ।

দশরথ উবাচ

কোণান্তকো রৌদ্র যমোঽথ বভ্রুঃ
কৃষ্ণঃ শনিঃ পিঙ্গল মন্দ সৌরি।
নিত্যংস্মৃতো যো হরতে চ পীড়াং
তস্মৈ নমঃ শ্রীরবিনন্দনায় ॥' ইত্যাদি

আর কবচের প্রারম্ভিক পাঠ —

খ) অস্য শ্রীশনৈশ্চর কবচস্য গৌতম ঋষি বিরাট ছন্দঃ
শনৈশ্চরো দেবতা আপদুদ্ধরণে বিনিযোগঃ

ওঁকারো মে শিরঃ পাতু
ঐংকারঃ কণ্ঠদেশকে।
হ্রীং মে হৃদি সদা পাতু
শ্রীং মে পাতু সদা মুখম্ ॥ ইত্যাদি

তারপর — ইতি ব্রহ্মযামলে বেদাশ্বর সংবাদে শনেঃ কবচং সমাপ্তম্।"

আবার কোন কোন স্তবের সঙ্গে কবচ অংশও সন্নিবিষ্ট থাকে। একই সঙ্গে স্তব ও কবচ হয়। বহুল প্রচারিত ও অতি পরিচিত আদ্যাস্তবটি উল্লেখযোগ্য। কুড়িটি শ্লোকে সম্পূর্ণ আদ্যা স্তোত্রটির আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে — পাঠ ফল বা

120847
- 3 JUL 1998
North Bengal University
Library
Raja Rammohanpur

ফলশ্রুতিটি সাধারণত যা স্তবের শেষে দেওয়া হয়, 'আদ্যাস্তোত্রে'— তা দেওয়া হয়েছে প্রারম্ভিক সাড়ে চারটি শ্লোকে। অবশ্য স্তোত্রাংশ শেষেও ১৫ সংখ্যক শ্লোকের শেষ চরণ ও ১৬ সংখ্যক শ্লোকের প্রথম চরণে ফলশ্রুতির অনুরণন শোনা যায়। যাহোক্ মূল স্তোত্রটি আরম্ভ হয়েছে পঞ্চম শ্লোকের দ্বিতীয় চরণ থেকে —

"ব্রহ্মাণী ব্রহ্মলোকে চ বৈকুণ্ঠে সর্বমঙ্গলা" — ইত্যাদি থেকে পঞ্চদশ শ্লোকের প্রথম চরণ পর্যন্ত

বিষ্ণুভক্তি প্রদা দুর্গা সুখদা মোক্ষদা সদা।

তারপর ১৭ থেকে ২০ শ্লোক পর্যন্ত আদ্যা কবচ —

"জয়া মে চাগ্রতঃ পাতু বিজয়া পাতু পৃষ্ঠতঃ"(১৭) ইত্যাদি থেকে — "ভয়ংকরী মহারৌদ্রী মহাভয়বিনাশিনী।" (২০) পর্যন্ত — ইতি ব্রহ্মযামলে ব্রহ্ম নারদ সংবাদে আদ্যাস্তোত্রং সমাপ্তম্।।" এখানে ভাষা বা রীতিতে স্তোত্র ও কবচের মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য নেই। পার্থক্য কেবল রক্ষায় অভিমুখিতার প্রাধান্য।

দ্রব্য — কর্ম ও বিধি স্তোত্র

সংস্কৃতে রচিত বিপুল স্তোত্র সাহিত্য-মহাসমুদ্রের পাশে দ্রব্য-কর্ম-বিধি স্তোত্র তিনটির সাকল্যে অধিষ্ঠান গোষ্পদ বা ততোধিক সংকীর্ণ বিন্দুবৎ। আবার তিনটিকে, বিশেষ করে কর্ম ও বিধিকে সর্বদা আলাদা করাও যায় না। কর্মের প্রেরণা ও শাস্ত্রীয় বিধান অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরিপূরক।

দ্রব্য বা বস্তু বিশেষের নদী, পর্বত, তীর্থ, তিথি, গাছ-লতা, মহিমা বা মাহাত্ম্য বর্ণনার নাম দ্রব্যস্তোত্র। কেবল বর্ণনা নয়, মাহাত্ম্য প্রকাশ। বর্ণনা খানিকটা থাকতে পারে কিন্তু মুখ্য বাচ্য তার মাহাত্ম্য কীর্তন। বৈদিক সাহিত্য থেকে পুরাণ, তন্ত্র ও আচার্যগণের রচনায়ও ঐ শ্রেণীর বহু স্তোত্র আছে। এই পর্যায়ে আচার্য শংকর রচিত কাশী স্তোত্র, মণিকর্ণিকা স্তোত্রাদি সমুচ্চ কাব্যসৌন্দর্যমণ্ডিত।

যথা – মণিকর্ণিকা স্তোত্রের একটি স্তবক –

তৎ তীরে মণিকর্ণিকে হরিহরৌ সাযুজ্য মুক্তি-প্রদৌ
বাদং তৌ কুরুতঃ পরস্পরমুভৌ জন্তোঃ প্রয়াণোৎসবে ।
মদ্রূপো মনুজোঽয়মস্তু হরিণা প্রোক্তঃ শিবো তৎক্ষণাৎ
তন্মধ্যাদ্ ভৃগুলাঞ্ছনো গরুড়গঃ পীতাম্বরো নির্গতঃ ॥

তন্ত্রে-পুরাণে– তুলসী গাছ, বিল্ববৃক্ষ, রুদ্রাক্ষ বিজয়া (সিদ্ধি) ইত্যাদির মহিমাত্মক স্তোত্রগুলি দ্রব্যস্তোত্র শ্রেণীভুক্ত । এখানে দুটি উদাহরণ দেওয়া গেল । একটি মৎস্য সূক্তের ষোড়শ পটলে – পঞ্চশ্লোকাত্মক তুলসী স্তোত্রের প্রারম্ভ শ্লোক –

ঈশ্বর উবাচ

ইন্দ্রাদ্যৈঃ সকলৈর্দেবৈরর্চিতা সুর সুন্দরীম্ ।
ভক্তানাং বরদাং বন্দে তুলসী মৌল্য রূপিণীম্ ॥ ইত্যাদি

সময়াচার তন্ত্রে প্রথম পটলে বিজয়া (সিদ্ধি) ও স্তবটি আধুনিক মনের কাছে কৌতুকাবহ । সপ্তশ্লোকে সম্পূর্ণ বিজয়া স্তোত্রের প্রথম শ্লোকটি এই –

ওঁ আনন্দদায়িনীং বন্দে সদানন্দ পদদ্বয়ে ।
আনন্দ কন্দলীং বন্দে সুচ্ছন্দ বোধরূপিণীম্ ॥ ইত্যাদি

বৈদিক সাহিত্যের মধুমতী সূক্ত "ওঁ মধুবাতা ঋতায়তে" (ঋগ্বেদ ১।৯০।৬-৯) ইত্যাদিকে শ্রেণীবিচারে দ্রব্যস্তোত্র শ্রেণীভুক্ত করায় কোন বাধা আছে কি ? তেমনি কর্ম ও বিধি স্তোত্র রূপে বৈদিক শান্তি বচন, স্বস্তিবাচনাদির কথা মনে করা খুব অযৌক্তিক মনে হয় না বোধ হয় ।

যাহোক – বাংলা ভাষায় এই ধারার অনুসরণ ক্ষীণ । তীর্থমঙ্গলাদি গ্রন্থে তীর্থমহিমার বর্ণনা আছে । মঙ্গলকাব্যেও দেখা যায় । তুলসী মহিমাদি মেয়েদের ব্রতকথায় – এবং সিদ্ধিগণ্ডিকাদির বিবরণ লোকসাহিত্যে কিছু কিছু দেখা যায় ।

অভিজন স্তোত্র

বিপুল সংস্কৃত স্তোত্র সাহিত্যের অতি অতি ক্ষীণ কিছু ভগ্নাংশ বাদ দিলে সবটাই অভিজন স্তোত্র। সেগুলির মধ্যে আবার দেবতাদের স্তোত্র-ই সর্বাধিক। প্রাগৈতিহাসিক বা বহু প্রাচীন কালের আদিম, অশিক্ষিত, সরল মানুষ থেকে সুরু করে সাম্প্রতিক কালের নবীন, শিক্ষিত, সূক্ষ্মবুদ্ধিসম্পন্ন সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ পর্যন্ত একটি সহজ সাধারণ বিশ্বাস এই যে এই বিশাল বিচিত্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি একটা আকস্মিক ঘটনা নয়, একান্ত নিরর্থক-ও নয়। এই সদাচঞ্চল পরিবর্তনশীল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মূলে আছে একটি সচেতন সত্তায় বিস্ময়কর নিত্যস্থিতি ও অবিচ্ছিন্ন বিকাশ বা অভিব্যক্তি। কেবল বহিরঙ্গ কার্য বা ফুল-ফল নয় অন্তরঙ্গ কারণ — মূল পর্যন্ত তার বিস্তার। কী সেটা এটাই প্রশ্ন করে মানুষ এবং তার পরিচয় পেতে চায়। এই বহুব্যাপ্ত অন্বেষার পথ ধরে মানুষ সৃষ্টি করেছে ধর্ম-দর্শন-বিজ্ঞান-সমাজ-শিল্প সাহিত্য — মানুষের সভ্যতা ও সংস্কৃতি। একটি সর্বাত্মক আদ্যন্ত অখণ্ড চৈতন্যশক্তি — নানা রূপে ও নামে, সবকিছুর অন্তর বাহির পরিব্যাপ্ত বিবর্তিত, বিকশিত হয়ে উঠেছে ও উঠছে — এই প্রত্যয়যুক্ত ভাবনা, চিন্তা — ধ্যানধারণা, অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির মাধ্যমেই ঘটেছিল প্রথম এই আস্বাদন। নিষ্প্রাণ অচেতন জড়ের গভীরেও যে বিরাজ করছে সুপ্ত প্রাণশক্তি স্ফুট চেতনা — তা এখন আর ধর্মীয় কুসংস্কার বা দার্শনিক কল্পনা নয়, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষালব্ধ সিদ্ধান্ত। বহুরূপী ও অনন্ত নামা এই সচেতন শক্তিটি বিভিন্ন স্থানে কালে — ব্রহ্ম, ঈশ্বর, ভগবান্, কৃষ্ণ, কালী, শিব, গড্, আল্লা নানা নামে ব্যাখ্যাত হয়েছে, আরাধ্য ও স্তবনীয় হয়েছে। এই নানা রূপের সাধারণ নাম দেবতা।

দেব শব্দের ব্যুৎপত্তি ও অর্থনিরূপণে নিরুক্তকার মহর্ষি যাস্ক বলেছেন — "দেবো দানাদ্ বা দীপনাদ্ বা দ্যোতনাদ্ বা দ্যুস্থানো ভবতীতি বা।" (নিরুক্ত-৭।১৫)। দান করেন যিনি, যিনি উজ্জ্বল, দ্যুতিময় বা স্বর্গে বাস করেন তিনি দেবতা। আবার দিব্ ধাতুর একটি অর্থ আছে ক্রীড়া। যিনি খেলেন, খেলান বা খেলতে ভালবাসেন তিনি দেবতা। দীপন বা উজ্জ্বলতা বহিরঙ্গ রূপ, দ্যোতনার মধ্যে

সামান্য অন্তরঙ্গ ভাবের পরিচয় আছে । যেমন আছে ক্রীড়াশীলতার মধ্যে । দ্যুস্থান অর্থাৎ স্বর্গের বাসিন্দা আর্যদেবতার পরিচয় গুণ কর্মগত নয় । দান – অর্থাৎ তিনি দিতে পারেন, প্রার্থনা করলে তার কাছ থেকে অভিলষিত বস্তু পাওয়া যায়, খেলার ছলে বা নীলাচ্ছলেও দিতে পারেন তিনি – বোধহয় এই ব্যাখ্যাটি স্তুতিকারী প্রার্থী মানুষের কাছে দেব-শব্দের মুখ্য ব্যঞ্জনা । স্তোত্র সাহিত্যের মূল কাঠামোটাকেই প্রার্থনা বা আবেদন-নিবেদন সর্বস্ব বললেও খুব অত্যুক্তি হয় না ।

স্তোত্র আছে সংস্কৃত সাহিত্যের বেদ, পুরাণ, তন্ত্রে এবং সিদ্ধ সাধক-বর্গের ও ধর্মাচার্যদের রচনায় । ঋগ্বেদের প্রায় পনর আনাই স্তোত্র মুখ্যতঃ অভিজন স্তোত্র । ঋগ্বেদের দেবতাদের স্থানানুসারে তিনটি বিভাগ – পৃথিবী স্থান দেবতা, অন্তরীক্ষ স্থান দেবতা এবং দ্যুস্থানের দেবতা । পৃথিবী স্থানের দেবতা – অগ্নি, পৃথিবী, অপ্, সোম । অন্তরীক্ষ স্থানের মুখ্য দেবতা – ইন্দ্র, রুদ্র, পর্জন্য । আর দ্যুস্থানের সূর্য, সবিতা, বিষ্ণু, মিত্র, পূষা, বরুণ, অশ্বিনীকুমার যুগল, উষা যম, বৃহস্পতি প্রমুখ ।

বৈদিক দেবতাদের বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন – প্রস্তুত অভি-সন্দর্ভের ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক । তাঁদের স্তবণীয় রূপটির অর্থাৎ প্রার্থনা পূরণকারী রূপটিই মুখ্য । বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের শক্তি-কেন্দ্রের বিভিন্ন প্রকাশ অনুসারে যে যে দিব্য রূপসমূহ মূর্ত হয় – যেমন, অগ্নি, সূর্য, মেঘ, বিদ্যুৎ, ঝঞ্ঝা-ঝটিকা – বিশেষ বিশেষ রূপ-বৈশিষ্ট্য নিয়ে ফুটে ওঠে – তারা এক এক জন দেবতা । স্থূল দৃষ্টিতে এইগুলি প্রাকৃতিক শক্তি বা জড়শক্তি । কিন্তু ভয়ে, বিস্ময়ে – তথা জীবনের প্রয়োজনে এই প্রাকৃতিক জড়শক্তি-গুলিকেই দেবতা বলে ভাবে ও আবেদন নিবেদন করে মানুষ । কেন করে ? কারণ আদিম তথা মৌল অন্ধ বিশ্বাস – যা পরে দার্শনিক প্রত্যয়ে সুস্থিত হয়ে এই সিদ্ধান্তে উপনীত যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সবকিছুই চৈতন্যময় । সবই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মস্বরূপ । কঠোপনিষদের ঘোষণা – যদিদং কিঞ্চ জগৎসর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্ ॥ (২।৩।২)

সাধারণভাবে বেদের তথা শাস্ত্রের ব্যাখ্যা ত্রিমুখী – আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক। জড় শক্তি রূপে বিচারের যে দৃষ্টি ও বিশ্লেষণ তা আধিভৌতিক। জড় তথা পঞ্চ মহাভূতের অন্তরে স্থিত দেব-শক্তিতে আস্থা রেখে যে বিচার ও পর্যালোচনা, তা আধিদৈবিক। আর – 'যা আছে ব্রহ্মাণ্ডে, তা আছে ভাণ্ডে' – এই লোকসূক্তিতে আভাসিত বিশ্বের যাবতীয় শক্তির স্থিতি আছে আত্মার মধ্যে ব্যষ্টির আধারে সমষ্টির আস্বাদন – তার নাম আধ্যাত্মিক দৃষ্টি। যাহোক, স্তোত্রাদির বিশেষ করে বৈদিক দেবতাদির স্তোত্রে আধিদৈবিক দৃষ্টির প্রসারণ। আর এই প্রত্যয়েই প্রার্থনা স্তোত্রসমূহ সুস্থিত।

কেবল বৈদিক সূক্তে নয়, পৌরাণিক তান্ত্রিক, লৌকিক সব স্তোত্রের মূলেই এই মানস্রিকতা বিদ্যমান। বস্তুর বা মূর্তির অন্তরে বা অন্তরালে দেবতার স্থিতি উপস্থিতি কল্পিত ও প্রত্যয়ে সুস্থিত না হলে স্তুতিবাক্য উচ্চারিত হবে কার উদ্দেশে। কার কাছে হবে আবেদন-নিবেদন প্রার্থনা ? সুতরাং একথা বলার মধ্যে কোন অত্যুক্তি হবে না মনে করি। যদি বলা হয় – যে স্তোত্র সাহিত্য কেবল আধিদৈবিক দৃষ্টি-প্রধান নয় – একেবারে আধিদৈবিক দৃষ্টিসর্বস্ব।

বৈদিক দেবতাদের মধ্যে ঋগ্বেদে মুখ্যতঃ ইন্দ্রদেবতার প্রাধান্য সর্বাধিক। ঋগ্বেদের সূক্তগুলির প্রায় এক-চতুর্থাংশ-ই ইন্দ্রপ্রশস্তি। কিন্তু পরে বৈদিক ভাবনার বিবর্তনে – বিশেষতঃ পৌরাণিক দেববূহে ইন্দ্রের স্থানটি গ্রহণ করেছেন উপেন্দ্র বা বিষ্ণু। এই একই ভাবে বিভিন্ন ভাবনায় পুরাণে, তন্ত্রাদিতে প্রাধান্য শিব ও শক্তিদেবতা সমূহ। এই পরিণাম প্রাপ্তির মূলে ক্রমশঃ ভয় ভীতি থেকে প্রীতি-ভক্তির বিকাশ ঘটেছে এবং তা উত্তরকালের স্তব-স্তুতির মধ্যে একটি বিশেষ স্থান করে নিয়েছে।

পঞ্চোপাসক – বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত, সৌর ও গাণপত্য – এই সম্প্রদায়গুলির মধ্যে, শেষের দুটির – সূর্য উপাসক সৌর ও গণেশ উপাসক গাণপত্য – যথাক্রমে বৈষ্ণব ও শৈব ধারার সঙ্গে সমন্বিত হয়েছে। পৌরাণিক ধ্যানমন্ত্রের মধ্যেও এর সাক্ষ্য পাওয়া যায়। যেমন বিষ্ণুর ধ্যানমন্ত্র – "ধ্যেয় সদা

সবিতৃমন্ডল মধ্যবর্তী নারায়ণঃ" ইত্যাদি । প্রচলিত সূর্যনারায়ণ শব্দটি-ও লক্ষণীয় । আর পৌরাণিক বিবরণে গণেশ হচ্ছে, শিব ও শক্তির সন্তান ।

এই একই ধারায় অপ্রধান দেবতা অর্থাৎ, লক্ষ্মী, সরস্বতী, গঙ্গা, মনসা, শীতলা প্রমুখ দেবতার উদ্ভব হয়েছে । শক্তিদেবতার নানা ভেদ – দশমহাবিদ্যা প্রমুখ দেবী-কল্পনা । তারপর এই ধারায়-ই – বাশুলী, ষষ্ঠী, সুবচনী, বিপত্তারিণী, ধর্মরাজ, মদনকাম, শনিঠাকুর, সত্যনারায়ণ, ওলাবিবি, বনবিবি, দক্ষিণরায়, কালুরায় প্রমুখ লৌকিক দেবতার আবির্ভাব । কেবল পুরাণতন্ত্র নয়, ব্রতকথাদির মধ্যে-ও স্তবস্তুতি দুর্লভ নয় । আর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে – সাধক ভক্ত ও আচার্যগণ-ও সংস্কৃত স্তোত্র সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন বিপুল ভাবে ।

সংস্কৃত স্তোত্র সাহিত্যের বিপুল বৈচিত্র্য ও বিস্তৃতি সম্বন্ধে মোটামুটি আলোচনা করা গেল । উল্লেখযোগ্য যে দ্রব্য-বিধি-কর্ম স্তোত্রাদির পরিধি অভিজন ধারার তুলনায় অতি সংকীর্ণ হলে-ও সাধারণভাবে বৈদিক-তান্ত্রিক-পৌরাণিক সাহিত্যে এমন কি আচার্যগণ রচিত স্তোত্র সাহিত্যে-ও ধারাবাহিকতা অবিচ্ছিন্ন । তবে মনে রাখা প্রয়োজন যে মুখ্য ধারা অভিজন স্তোত্রের মধ্যে প্রবাহিত । আবার প্রকারে সংখ্যায় ও সাহিত্যিক শিল্পগুণে ও মাধুর্যে একচ্ছত্র গৌরবের অধিকারী এই শাখাটি । বৈদিক সাহিত্যে সংহিতা ভাগে ইন্দ্রাদি দেবতার স্তোত্র সংখ্যায় সর্বাধিক । কিন্তু বৈদিক ভাষা ক্রমশ দুরূহ হওয়ায় লৌকিক সংস্কৃতে রচিত পুরাণতন্ত্রাদিতে উল্লিখিত স্তোত্রাবলীর প্রভাব – তথা আবেদন বাংলা ভাষা প্রমুখ নব্য ভারতীয় আর্যভাষাতে রচিত সাহিত্যে যেমন সরাসরি পড়েছে – বৈদিক ভাষায় উত্তরাধিকার তেমনভাবে বোধহয় প্রতিষ্ঠিত হয়নি । লৌকিক সংস্কৃতে রচিত কবিগণের ও আচার্যগণের স্তোত্র সাহিত্যের মাধুর্য ও আস্বাদন – বিশেষতঃ ভক্তি সাহিত্যে একটি নতুন মাত্রা দিয়েছে ।

তবে বৈদিক সাহিত্যের প্রার্থনা মন্ত্রগুলি বিশেষতঃ শান্তিবচন, স্বস্তিবাচন, সংজ্ঞান সূক্ত, মধুমতী সূক্ত ইত্যাদি এখনো সঙ্গীত রূপে — মুখ্যতঃ প্রাতিষ্ঠানিক

মঙ্গলাচরণ সূক্ত-রূপে সগৌরবে সন্নিহিত। তাছাড়া, বিশ্বদেব সূক্তম্, পুরুষ সূক্ত হিরণ্যগর্ভ সূক্ত, সৃষ্টিসূক্ত, দেবীসূক্ত প্রমুখ স্তোত্রগুলির প্রভাব কিছুটা গৌণ-ভাবে হলেও লৌকিক সংস্কৃত সাহিত্যের উদার ভিত্তিভূমি রূপে — উত্তমর্ণরূপে — তার গৌরবময় অধিষ্ঠান — ঐতিহাসিক সত্যরূপে স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত।

অধ্যায়ের উপসংহারে বলা যায় যে — লৌকিক সংস্কৃত স্তোত্র সাহিত্য — পুরাণ, তন্ত্র ও আচার্যবর্গের রচনা — মূলতঃ এই তিনটি ধারা গঙ্গা-যমুনা-ব্রহ্ম-পুত্রের মতো প্রবাহিত হয়ে ভক্তিরসের সমভূমিতে অবতরণ করে — সমন্বিত হয়ে বাংলা প্রমুখ আধুনিক ভারতীয় ভাষাগোষ্ঠীর অক্ষয় উৎস রূপে স্থিত। এই উৎসমূল থেকেই প্রধানতঃ ভক্তি-সাহিত্য ও সঙ্গীতের আধারে — নানা তরঙ্গভঙ্গীতে যে সাহিত্য স্রোতস্বিনী আত্মপ্রকাশ করেছে — তার প্রবাহ কিন্তু কেবল মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের মধ্যেই নিঃশেষিত হয়ে যায়নি — আধুনিক সাহিত্য সঙ্গীতের মধ্যেও কখনো প্রকাশ্যে কখনো বা অন্তঃসলিলা রূপে সতত বিদ্যমান ও ক্রীড়াশীল। পরবর্তী অধ্যায়সমূহে তার কথা আলোচিত হবে।